

# সাম্রাজ্যের বিস্তার, নগর-রাষ্ট্র আর বৈচিত্র্য: পরিচয়, ভাষা, জীবনের অবিরাম বদল

## ভাষা ও লেখার নতুন ধরন, সমাজের পরিবর্তন

গত অধ্যায়ে তোমরা হরপ্পা সভ্যতা এবং সেই সভ্যতার ধীরে ধীরে অবনমনের পরে ভারত উপমহাদেশে নানা ধরনের তাম্রপ্রস্তরযুগীয় আর নব্যপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা আর নতুন বিকাশ লক্ষ্য করেছো। আরও জেনেছো যে, ভারত উপমহাদেশে বিভিন্ন সময়ে ডেউয়ের মতন একেক দল মানুষ তাদের সংস্কৃতি, জীবনযাপন, দৈহিক বৈশিষ্ট্য আর ভাষা নিয়ে এসেছে। হরপ্পা সভ্যতার বিকাশ ঘটায় এমন মিশ্রিত মানুষের দল প্রধান ভূমিকা রেখেছিল। হরপ্পা সভ্যতার অবনমনের পরে সেখানকার মানুষ গঙ্গা-যমুনা অববাহিকার উত্তর-পশ্চিমাংশে, দক্ষিণ ভারতে আর পূর্ব ভারতে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে চলে যেতে থাকে। আনু. সাধারণ ২০০০ থেকে ১৫০০ পূর্বাব্দ এবং তার পরেও আরেক দল মানুষ বর্তমান রাশিয়া-ইউক্রেন-মধ্য এশিয়ার বিস্তৃত তৃণভূমি অঞ্চল থেকে দলে দলে ভারত উপমহাদেশে আগমন করতে থাকে। তারা নিজেদের আর্য ভাষী বলে পরিচয় দিতেন ইতিহাসবিদগণ মনে করেন, আর্য শব্দটি কোনো জাতিগত, ধর্মীয় বা জীবনযাপনগত শ্রেষ্ঠত্ব যেমন প্রকাশ করে না; তেমনি একটা বিশেষ নরগোষ্ঠীকেও প্রকাশ করে না। তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, হরপ্পা সভ্যতার মানুষ কোন ভাষায় কথা বলতো, কোন লিপিতে লিখতো। সমসাময়িক মিসরীয় ও মেসোপটেমীয় সভ্যতার ভাষা ও লিপি যেভাবে পড়া সম্ভব হয়েছে, হরপ্পার বিভিন্ন নগর-কেন্দ্র ও বসতিগুলোতে বসবাসকারী মানুষদের ভাষা ও লিপি এখনো পড়া সম্ভব হয়নি। তবে অনেক গবেষক আছেন যারা ভাষার ইতিহাস নিয়ে বিভিন্ন ভাবেই গবেষণা করেন। তাদের ঐতিহাসিক ভাষাতাত্ত্বিক বলা হয়। আবার কখনো কখনো তাদের ভাষাতাত্ত্বিক প্রত্নতত্ত্ববিদও বলা হয়ে থাকে।

তৃণভূমি থেকে আগত এসব মানুষ মূলত পশুপালক ও যাযাবর সম্প্রদায়ের ছিল। তারা ঘোড়া পোষ মানিয়েছিল। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার জন্য ঘোড়া ও ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহার করায় তাদের কম সময় লাগতো। তারা কৃষিকাজ যেমন জানতো না, তেমনি স্থায়ীভাবে বসবাস করার মতন নগর তৈরি করাও তারা শিখে উঠতে পারে নি। তাদের ভাষাও ভিন্ন ছিল। সকলের ভাষা এক ছিল না। ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ববিদগণ তাদের ভাষা এবং তাদের বিভিন্ন স্থানে অভিবাসনের ফলে নানা স্থানীয় ভাষার সঙ্গে সংমিশ্রণে বিভিন্ন ভাষা তৈরি হয়েছে। এসব ভাষাকে একত্রে ভাষাতত্ত্বিকগণ একটা শ্রেণিতে রেখেছেন। এদের বলে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা শ্রেণি।

### অভিবাসন:

অভিবাসন হলো এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে মানুষের স্থানান্তর। বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠী বা মানুষের গ্রাম থেকে শহরে আগমন, স্থান বদল, কয়েক দিন কিংবা বহু বছর নিজের আদি বা স্থায়ী বাড়ি থেকে অনুপস্থিতি।

## তৃণভূমি :

ঘাসে আচ্ছাদিত বিশাল এলাকাকে তৃণভূমি বলে। এখানে ঘাসের বৃদ্ধির জন্য অনুকূল পরিবেশ থাকে কিন্তু লম্বা গাছপালা, বিশেষ করে গাছ এবং গুল্মগুলো জন্য থাকে না।

বৈশিষ্ট্য:

তৃণভূমিতে বিভিন্ন ধরনের ঘাস জন্মে। তৃণভূমিতে কোনো গাছ না-ও থাকতে পারে আর থাকলেও শুধু বিক্ষিপ্ত কিছু। সাধারণত জমি সমতল হয়।

তৃণভূমি গবাদি পশু চরানোর জন্য উত্তম। তৃণভূমিতে চাষের জন্য ভালো মাটিও রয়েছে।

## তৃণভূমির প্রকারভেদ:

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় তৃণভূমিকে সাভানা বলা হয়। আফ্রিকা, ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ব্রাজিল এবং অস্ট্রেলিয়ায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় তৃণভূমির এলাকা রয়েছে। সাভানার জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। তাপমাত্রা উচ্চ এবং জলবায়ু আর্দ্র ও শুষ্ক। শুষ্ক মৌসুমে সাভানায় অল্প বৃষ্টিপাত হয়।

নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমির জলবায়ু কম চরমভাবাপন্ন। উত্তর আমেরিকার প্রেইরিগুলো নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি। আর্জেন্টিনার পাম্পাস, দক্ষিণ আফ্রিকার ভেল্ড এবং মধ্য এশিয়ার স্টেপসও তাই। অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বিশাল রেঞ্জল্যান্ডগুলোও নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি।



অন্যদিকে, হরপ্পা সভ্যতার অবনমনের পরে যে জনগোষ্ঠীগুলো দক্ষিণ ভারতে (বিশেষ করে মধ্য ভারতের বিক্ষ্য পর্বতমালার দক্ষিণে) চলে গিয়েছিল, তাদের সঙ্গে স্থানীয় মানুষদের সংমিশ্রণে তৈরি হলো যে ভাষা শ্রেণি, তার নাম দেওয়া হয়েছে দ্রাবিড়ীয় ভাষা। ভাষাতাত্ত্বিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, হরপ্পা সভ্যতার মানুষেরা মূলত এই দ্রাবিড়ীয় ভাষার কাছাকাছি কোনো একটি ভাষায় কথা বলতো। তৃণভূমি থেকে আসা পশুপালকরা ভারত উপমহাদেশে আসার পরে অনিবার্যভাবেই স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে তাদের মিশ্রণ ঘটে। সম্প্রতি গবেষণায় দেখা গেছে, তৃণভূমি থেকে আসা এই দলগুলো মূলত পুরুষপ্রধান ছিল। ভারত উপমহাদেশে আসার পরে তারা স্থানীয় দ্রাবিড়ীয় ভাষী নারীদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। ফলে তাদের বংশধররা ধীরে ধীরে তাদের ভাষা আর আগত তৃণভূমির জনগোষ্ঠীর ভাষার মিশ্রণে কথা বলতে শুরু করেছে। আগত জনগোষ্ঠীগুলো যে ভাষায় প্রথম দিকে কথা বলতো তা ছিল সংস্কৃত ভাষার একটি আদি রূপ। তাদের মধ্যে শ্রুত ও স্মৃতিতে সঞ্চালিত বিভিন্ন ধর্মোচরণমূলক বিধিবিধান পরে লিপিবদ্ধ হতে শুরু করে। এই লিপিবদ্ধ রূপই হলো ঋগ্বেদের বেশি কয়েকটি অংশ। বিভিন্ন সময়ে নতুন নতুন বিধিবিধান ও সূত্র যুক্ত হতে হতে পরে ঋগ্বেদ সংহিতা পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করে। বেদের অন্যান্য বিভিন্ন সংহিতা (যেমন: সাম, যজুর এবং অথর্ব বেদ সংহিতা গুলো আর প্রতিটা সংহিতাগুলোর সঙ্গে যুক্ত ব্রাহ্মণ, উপনিষদ এবং আরণ্যকগুলো) আদি সংস্করণের পরে বিভিন্ন সময়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিকগণ দেখিয়েছেন যে, আদি সংস্কৃত থেকে পরবর্তী সময়ে সংহিতা ও অন্য গ্রন্থগুলোর সংস্কৃত ভাষায় যে ফারাক তাতে দ্রাবিড়ীয় ভাষাগুলোর সঙ্গে মিশ্রণের প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন একটা প্রমাণের কথা বললে তোমরা বুঝতে পারবে। আদি সংস্কৃততে বা অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা (যেমন: প্রাকৃত) মূর্ধ্য-ধ্বনিটি ছিল না (আমাদের ব্যঞ্জন বর্ণে ট, ঠ, দ, ধ, ণ, ড আর ঢ মূর্ধ্য ধ্বনি, কারণ এগুলো উচ্চারণ করার সময় জিহ্বার আগা উল্টিয়ে মাড়ির গোড়ায় বা মূর্ধ্য শক্তভাবে ছুঁতে হয়)। তবে এই ধ্বনিগুলোর অস্তিত্ব ছিল দ্রাবিড়ীয় ভাষায়। তাই সংস্কৃততে মূর্ধ্য ধ্বনির ব্যবহার শুরু হয়েছে বেশ পরে। এ ছাড়াও ঋগ্বেদে দ্রাবিড়ীয় ভাষার অনেকগুলো শব্দ পাওয়া গেছে। ওই শব্দগুলোও ভাষাভাষী গোষ্ঠীগুলোর মিশ্রণের প্রমাণ বহন করে।



দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অস্ট্রোএশিয়াটিক জনগোষ্ঠীগুলোর অভিবাসনের পথ।





## মানচিত্রে অক্ষ ও দ্রাঘিমা রেখা

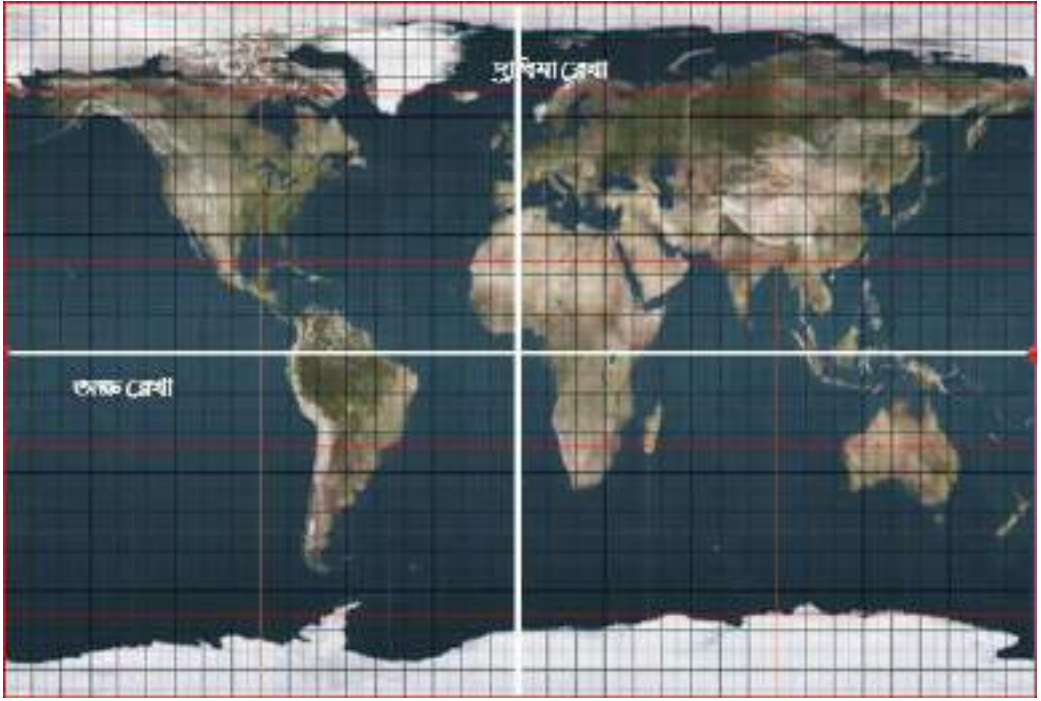
তোমরা তো দেখলে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ নানা প্রয়োজনে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অভিবাসন করেছে, গড়ে তুলেছে বিভিন্ন জনপদ, করেছে বিভিন্ন দিকে বাণিজ্য যাত্রা। এসকল কাজে তাদের প্রয়োজন হতো পথ চেনার জন্য দিক নির্ণয় করা। আদি কাল থেকে মানুষ বিভিন্ন ভাবে পথ চিনে নেওয়ার কাজ করতো। কখনও ধ্রুব তারা বা অন্য কোন তারার সাহায্যে; তারপর এলো কম্পাসের ব্যবহার। বর্তমানে তো আমরা গুগল ম্যাপ বা জিপিএস ব্যবহার করে আমাদের পথ সহজেই চিনে নিতে পারি। কিন্তু জানো কি এই গুগল ম্যাপ বা জিপিএস কিভাবে কাজ করে? এটা জানতে আমাদের প্রথমে খুব ভালো পৃথিবীর মানচিত্র বা গ্লোব সম্পর্কে বুঝতে হবে।

আমাদের পৃথিবী সৌরজগতের এক বিস্ময়কর গ্রহ। প্রাণ ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান কেবল এই গ্রহে সঠিক মাত্রায় রয়েছে। আচ্ছা, যদি বলি আমাদের এই পৃথিবীর আকার কেমন? আমরা চারদিকে তাকালে কি এর আকার বুঝতে পারি? মনে হয় এটি যেন একটি গোলাকার চাকতি বা থালার মতো, তাই না? আপাতদৃষ্টিতে পৃথিবীকে একটি থালার মতো মনে হয়। মনে হয় ঘরবাড়ি নিয়ে আমরা ঐ থালা বা চাকতির উপরে আছি। কিন্তু পৃথিবী থালা বা চাকতির মতো নয়। এটি বৃত্তাকার কিন্তু চ্যাপ্টা নয়, গোলাকার তবে পুরোপুরি গোলাকারও নয়। পৃথিবী উত্তর দক্ষিণ দিকে কিছুটা চাপা।

যদি বলি পৃথিবীর মানচিত্র তাহলে নিশ্চয় তোমাদের গ্লোবের কথাই মনে আসবে তাই না?



তোমরা নিশ্চয় গ্লোবে দেখেছ উপর-নিচ এবং পাশাপাশি অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণ ওপূর্ব-পশ্চিম বরাবর কিছু কল্পিত রেখা আছে। তাদের আবার নামও আছে। পুরো ভূগোলক জুড়ে উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর রেখাগুলোকে বলে দ্রাঘিমা রেখা আর পূর্ব পশ্চিম বরাবর সমান্তরাল রেখাগুলোকে বলে অক্ষ রেখা।



এই অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখাগুলো পরস্পরকে ছেদ করে অনেকগুলো প্রায় চারকোনা খোপ তৈরি করেছে, তাই না? এইগুলো মূলত এক একটি গ্রিড যেগুলো তোমরা গ্রাফ কাগজে দেখেছ। গ্রাফ পেপারে যেমন তুমি এই গ্রিডের সাহায্যে নিখুঁত পরিমাপ করতে পারছ তেমনি এই রেখাগুলো দ্বারা তৈরি গ্রিডের সাহায্যে পৃথিবীর নিখুঁত মানচিত্র আঁকা সম্ভব হয়েছে।



তোমরা জ্যামিতিতে কোণ পরিমাপের একক হিসেবে যে ডিগ্রী ব্যবহার কর, এই রেখাগুলোকে সেই ডিগ্রী দিয়েই চিহ্নিত করা হয়। বিষুবরেখাকে ০০ ডিগ্রী ধরে উত্তর দক্ষিণে ৯০০ করে মোট ১৮০০ এবং মূল মধ্য রেখাকে ০০ ডিগ্রী ধরে পূর্ব পশ্চিমে ১৮০০ করে মোট ৩৬০ ডিগ্রী পর্যন্ত ধরা হয়। এর মধ্যে কয়েকটির আবার আলাদা আলাদা নাম রয়েছে। চলো আমরা নিচের ছবি ও গ্লোবের সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু অক্ষ ও দ্রাঘিমা রেখার নাম খুঁজে বের করি এবং সেগুলো একটি ছক আকারে লিখে ফেলি।



অক্ষরেখা



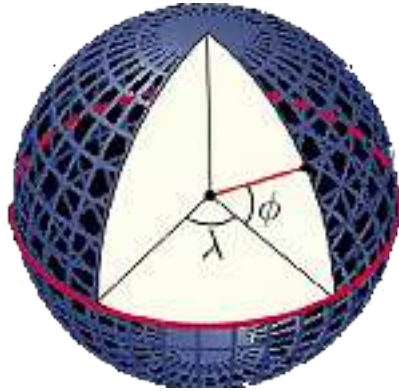
দ্রাঘিমা রেখা

অক্ষরেখা	দ্রাঘিমা রেখা

এবার দেখি এই অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখা থেকে কিভাবে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ বের করা যায়। তার আগে কোণ নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। একটি বিন্দু থেকে দুটি রশ্মি যে অবস্থান তৈরি করে তাকে কোণ বলা হয়, যাকে সাধারণত ডিগ্রী একক দ্বারা পরিমাপ করা হয়। ডিগ্রীর এই পরিমাণ দিয়ে কিন্তু রশ্মি দুটি কত বড় কিংবা একটি রশ্মি আর একটি রশ্মির চেয়ে কত দূরে তা বোঝানো হয় না। একটি রশ্মিকে স্থির ধরে রশ্মিটির যেকোনো একটি বিন্দু অন্য রশ্মিটির প্রারম্ভিক বিন্দু স্থির রেখে সম দূরত্বের বিন্দুটি কতটুকু সরেছে (বা ঘুরেছে), তা বোঝানো হয়।

চিত্রে দেখ শীর্ষবিন্দুর (যে বিন্দুতে কোণ তৈরি হলো) কাছে হলে  $300$  বেশ খাট আবার দূরে হলে বেশ লম্বা/বড়। (এখানে একটা  $300$  কোণের ছবি হবে।)

নিরক্ষরেখা হতে পূর্ব বা পশ্চিমে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে সে স্থানের অক্ষাংশ (Latitude) বলে। মূলমধ্য রেখা হতে উত্তর বা দক্ষিণে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্বকে সে স্থানের দ্রাঘিমাংশ (Longitude) বলে। তোমরা কিন্তু দূরত্ব বলাতেই এটাকে কিলোমিটারের মত ভেবে নিও না। কিলোমিটার হলো রৈখিক দূরত্বের (Linear distance) একক আর ডিগ্রী হলো কৌণিক দূরত্বের (Angular distance) একক।



অক্ষাংশ ( $\phi$ ) এবং দ্রাঘিমাংশ ( $\lambda$ )



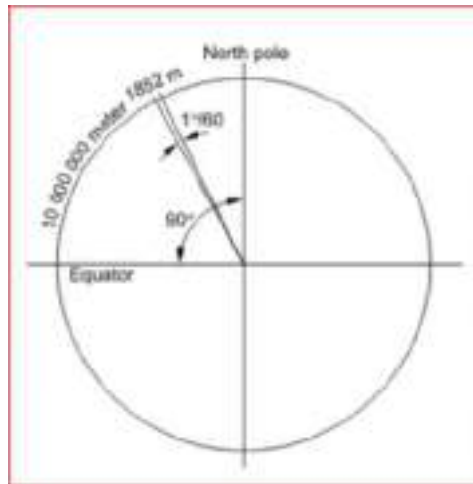
তোমরা চাইলে ভূপৃষ্ঠের এই কৌণিক দূরত্বকে রৈখিক দূরত্বে হিসাব করতে পার। তোমরা জান একটি সম্পূর্ণ ঘূর্ণনের পরিমাণ হলো ৩৬০০। পৃথিবীর পরিধি (একবার ঘুরে এলে) বিষুব রেখা বরাবর ৪০,০৭৫ মিলোমিটারের মত, একে ৩৬০ দিয়ে ভাগ দিলে ১১১ এর চেয়ে একটু বেশি হয়। অর্থাৎ ১ ডিগ্রী অক্ষাংশ কৌণিক দূরত্ব সমান ১১১ কিলোমিটারের একটু বেশি। অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ কে ডিগ্রি, মিনিট ও সেকেন্ড একক দ্বারা প্রকাশ করা হয়। একটি ডিগ্রি ৬০ মিনিটে বিভক্ত। এক মিনিটকে আবার ৬০ সেকেন্ডে ভাগ করা যায়।



এই মানচিত্রের চিহ্নিত অংশটি ১০। একে ৬০ মিনিটে ভাগ করে দেখাতে হবে। আবার ৬০ মিনিটের ১ মিনিট কে ৬০ সেকেন্ডে ভাগ করে দেখাতে হবে।

তোমরা নিশ্চয় সাগর মহাসাগরের দূরত্ব মাপতে মাইলের আগে নটিক্যাল শব্দটির ব্যবহার দেখেছো তাই না! এই নটিক্যাল মাইল কিভাবে এলো জানো? নটিক্যাল মাইল ভূমিতে এক মাইলের চেয়ে সামান্য লম্বা। এই নটিক্যাল মাইল কিন্তু পৃথিবীর দ্রাঘিমাংশ এবং অক্ষাংশ স্থানাঙ্কের উপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়। এক নটিক্যাল মাইল অক্ষাংশের এক মিনিটের সমান। আমরা যদি একটু হিসাব হরে দেখি তাহলে-

পৃথিবীর গড় পরিধি প্রায় ৪০,০৪২ কিলোমিটার কে  $২১৬০০$  [৩৬০ (ডিগ্রী)  $\times$  ৬০ (মিনিট)] দিয়ে ভাগ করলে ১ নটিক্যাল মাইল হয়। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের বৃত্তচাপের ১ মিনিট অক্ষাংশের দৈর্ঘ্য ১ নটিক্যাল মাইল। উল্লেখ্য, নটিক্যাল কিলোমিটার বলে কিছু নেই। ১ নটিক্যাল মাইল = ১.১৫ মাইল (প্রায়) = ১.৮৫২ কিলোমিটার (প্রায়)



নটিক্যাল মাইল

অনেক কিছু জানা হলো, চলো এখন আমরা একটা মজার খেলা খেলি। আমরা দুটি দলে ভাগ হয়ে যাবো। একদল থেকে একজন একজন করে গ্লোব দেখে একটি করে স্থানের নাম বলবে অন্যদল থেকে একজন একজন করে এসে বোর্ডে সেই স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ বের করে লিখবে। একবার একদল স্থানের নাম বলবে এবং একবার অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ বের করবে। পর্যায়েক্রমে সবাই একটি করে স্থানের নাম বলবে এবং অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ বের করবে।



বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের সানাউলি নামের স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে পাওয়া দুই চাকার রথ ও অস্ত্র। সময়কাল অনুসারে এই আবিষ্কার প্রাক-সাধারণ ১৯০০-১৮০০ অব্দের। স্তূপ তৃণভূমি থেকে দলবদ্ধভাবে অভিবাসনের ধারণার সঙ্গে এই আবিষ্কারের সময়কাল মিলে যায়।

এই গ্রন্থগুলো থেকে ওই সময়ে মানুষের ইতিহাস সম্পর্কেও বিভিন্ন বিষয় জানা যায়। যেমন একটা সময়ে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বা গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ হয়। একদিকে ছিল ভারত গোত্রের সদস্যরা আর অন্যদিকে দশটি গোত্রের সদস্যগণ। এই যুদ্ধের পরে ভারত গোত্রের আধিপত্য তৈরি হয় উত্তর-পশ্চিম ভারত উপমহাদেশে। ফলে যারা নিজেদের আর্য দাবি করেছেন বা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও নানা বিষয় নিয়ে যুদ্ধ ও সংঘাত যে হয়েছিল তারও বিভিন্ন প্রমাণ পাওয়া যায়। এই যুদ্ধ এবং বিভিন্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী গোষ্ঠীর গঙ্গা-যমুনা অববাহিকার বাইরে ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে পরে বিভিন্ন মহাজনপদ বা গোত্রভিত্তিক অঞ্চল তৈরি হয়।

### মালভূমি:

মালভূমি সমুদ্র সমতল থেকে ৩০০ মিটার বা আরও কিছুটা উর্ধ্বে অবস্থিত খাড়া ঢালযুক্ত সুবিস্তৃত তরঙ্গায়িত বা সামান্য বন্ধুর ভূভাগ মালভূমি নামে পরিচিত। আকৃতিগতভাবে মালভূমি অনেকটা টেবিলের মতো দেখতে হওয়ায় একে টেবিল ল্যান্ড বলে। যেমন ভারতের দাক্ষিণাত্য ও ছোট নাগপুর মালভূমি, তিব্বতের পামির মালভূমি ইত্যাদি।

আগ্নেয়গিরির ম্যাগমা উপরে উঠে, লাভার নিষ্কাশন এবং জল ও হিমবাহ দ্বারা ভূমি ক্ষয়সহ বেশ কয়েকটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মালভূমি গঠিত হতে পারে।



তারা আরও ভাষাগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসেছে। এই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে একটি হলো অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা গোষ্ঠী। মূলত চীনে কৃষিকাজ, বিশেষ করে ধানচাষ আবিষ্কৃত হওয়ার পরে চীন থেকে স্থলপথে একটি গোষ্ঠী ভারত উপমহাদেশে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অভিবাসিত হয়। এই গোষ্ঠীই অস্ট্রো-এশিয়াটিক বিভিন্ন ভাষার বিকাশ ঘটায় (যেমন: মুন্ডা ভাষা, খাসিদের ভাষা)। অন্যদিকে, তিব্বত-বার্মা ধারার আরেকটি ভাষাগোষ্ঠীও ভারত উপমহাদেশের পূর্ব প্রান্ত দিয়ে আগমন করেন মোটামুটি একই সময়ে। সেই ভাষাভাষী গোষ্ঠীগুলোও পরে বিভিন্ন ভাষার বিকাশ ঘটিয়েছে অন্য ভাষাভাষী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে মিশ্রণের মাধ্যমে। এ ছাড়াও আছে কিছু ভাষাগোষ্ঠী যেগুলোর মধ্যে পরিবর্তন তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে।

তাহলে তোমরা স্পষ্টই জানতে পারলে যে, কোনো ভাষাই বিশুদ্ধ, অপরিবর্তনীয় এবং মৌলিক নয়। বিভিন্ন ভাষার মিশ্রণ থেকে যেমন বিভিন্ন নতুন ভাষার জন্ম হয়েছে। তেমনই বিদ্যমান ভাষায় পরিবর্তন এসেছে। আরও পরে ইতিহাসের হাজার হাজার বছরে আরও নানা ধরনের ভাষাভাষী মানুষ ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এসেছে। একদল মানুষের সঙ্গে আরেক দল মানুষের জ্ঞাতিসম্পর্ক তৈরি হয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগাযোগ হয়েছে, নতুন ধারণা, চিন্তা, চর্চা তৈরি হয়েছে। আজ আমরা যে প্রমিত বাংলায় কথা বলি, সেই বাংলা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর একটি হলেও তাতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষার, ধ্বনির, ভাব প্রকাশের চিহ্নের মিশ্রণ ও সমাবেশ ঘটেছে। তোমরা যদি তোমাদের চারপাশের মানুষের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো, তাহলে দেখবে আমরা এখনো বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণে ও ধ্বনি ব্যবহার করি, শব্দ ব্যবহার করি। তাই ভাষার ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য একদিক থেকে আমাদের ইতিহাসে বিভিন্ন নরগোষ্ঠী ও ভাষার যোগাযোগ, মিশ্রণ আর মিলনের খুব বড় প্রমাণ। সমাজ ও জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে এই ভাষার পরিবর্তনও তাই যুক্ত। আমরা আরও কিছু এমন পরিবর্তন ও ধারাবাহিকভাবে টিকে থাকা ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে আলাপ করবো।

আমরা তো জানলাম কোনো ভাষায় মৌলিক বা অপরিবর্তনীয় নয়। এখন একটা মজার কাজ করি চলো। তুমি যে কোনো একটা বাক্য তোমার পরিবারের সকল সদস্যকে বলে দাও যা তারা নিজ নিজ জন্মস্থানের আঞ্চলিক ভাষায় উচ্চারণ করে তোমাকে শোনাবে। এবার তুমি সেটা নিচের ছকে লিখে ফেলো।

পরিবারের সদস্য	উচ্চারিত বাক্য	আগত স্থান



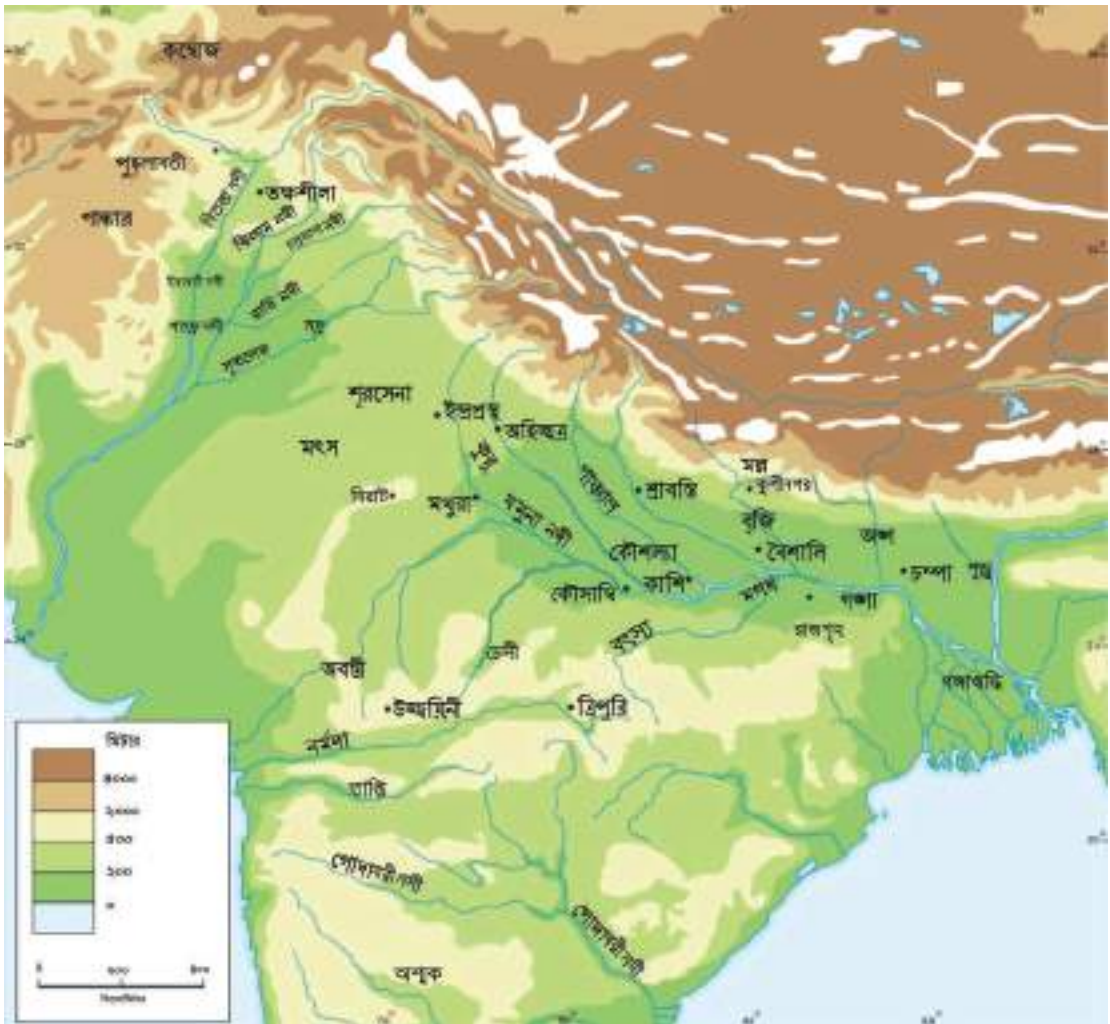
## লৌহ যুগ, দ্বিতীয় নগর সভ্যতা আর পরিবেশ: সাম্রাজ্য বিস্তার ও ভাঙনের বৈচিত্র্য

আনুমানিক ষষ্ঠ-চতুর্থ সাধারণ পূর্বাব্দের শতকে ভারত উপমহাদেশে একসঙ্গে কতকগুলো বড় বদল চূড়ান্ত রূপ পায়। লোহার ব্যবহারের কারণে লাঙলের ফলায় পরিবর্তন আসে। কৃষিকাজের নানা ক্ষেত্রে লোহার তৈরি বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহারের কারণে অনেক বেশি জমি চাষাবাদ করা সম্ভব হয়। আগে যেসব জমিতে তামা বা রৌপ্য বা কাঠের লাঙল দিয়ে চাষাবাদ করা সম্ভব হতো না, সেসব জমিও চাষাবাদের আওতায় আসে। একই সঙ্গে চিন্তা ও জ্ঞানের জগতে বিভিন্নমুখী তর্ক-বিতর্ক তৈরি হয়। গৌতম বুদ্ধ এবং মহাবীর এ সময়ই ভারত উপমহাদেশের পূর্ব দিকের মগধ ও সংলগ্ন অঞ্চলে নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। এই ধর্মমত বৈদিক ধর্মের নানা চিন্তাকে প্রশ্ন করা শুরু করে। পাশাপাশি আরও নানা চিন্তা ও জ্ঞান চর্চা শুরু হয়। এর মানে কিন্তু এই নয় যে, এই সময়ের আগে চিন্তা-তর্ক-বিতর্ক ছিল না। তবে এই সময় থেকেই এসব চিন্তা সূত্র এক-দুই শতক পরের লিখিত উৎসগুলো থেকে পাওয়া যায়।



পাথরে খোদিত গৌতম বুদ্ধের ভাস্কর্য

বৈদিক চিন্তা আগে মুখে মুখে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের মানুষ শিখত। পরে এই সময়ের ঠিক আগেই বৈদিক চিন্তা এবং তার নানারকমের ভাষ্য লিপিবদ্ধ হওয়া শুরু করে। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, তামিলসহ আরও নানান ভাষায় এসব চিন্তা ও সাহিত্য লিপিবদ্ধ হয়েছিল। মুশকিল হলো, অনেক উৎসেরই লিখিত হওয়ার তারিখ বা সময় সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। কারণ, মুখ থেকে মুখে শুনে মনে রেখে আবার পরের প্রজন্মকে বলে এসব প্রথমে প্রজন্মের পর প্রজন্ম সঞ্চারিত হয়েছে। এভাবে যখন শত শত বছর ধরে মানুষের স্মৃতিতে বিভিন্ন কথা থাকে আর সেই কথা ও ভাষ্য শ্রুতি (শোনা বা শ্রবণ করা) আর কথনের (বলা) মাধ্যমে একটি সমাজ মনে রাখে, তখন সেই কথা ও ভাষ্যে বিভিন্ন বদল ও রূপান্তর ঘটে। যখন সেই কথা লিখিত রূপ পায়, তখন একটা নির্দিষ্ট ভাষ্য তৈরি হয়। আবার শত বছর ধরে এই লিখিত রূপ আর স্মৃতি ও শ্রুতিনির্ভর কথনের কাজ চলতে থাকে লিখিত রূপটির পাশাপাশি। অন্য আরেকজন যখন আবার লেখেন, পরের কোনো সময়ে তার কাহিনি, ভাষ্য, ধরন পাল্টে যায়। ফলে একই টেক্সট বা লিখিত রূপের নানা সময়ে, নানা স্থান ভিন্ন ভিন্ন রূপ তৈরি হয়েছে। কোন রূপটি আগের আর কোন রূপটি পরের তা খুঁজে বের করা সহজ কাজ না। মাঝে মাঝে অসম্ভবও বটে। তাই এই সময়ের অনেক লিখিত উৎসের সময়কাল আর কাহিনির ঘটনা আসলেও অতীতে ঘটেছিল কি না, বোঝা মুশকিল। ইতিহাসবিদগণের একটা বড় দায়িত্ব পরীক্ষা ও নিরীক্ষা করে করে বিভিন্ন সময়ের সঠিক আর নির্ভরযোগ্য বিবরণ চিহ্নিত করা। লিখিত উৎস বা উপাদান থাকার সুবিধা যেমন আছে, তেমনই অসুবিধাও আছে। সতর্ক না-থাকলে কাল্পনিক অনেক ঘটনাকেও বাস্তব বলে ভুল হতে পারে।



যোলোটি মহাজনপদ ভারত উপমহাদেশের কোন কোন অঞ্চলে অবস্থিত ছিল তা এই মানচিত্রে দেখানো হয়েছে। [ উৎস : উপেন্দ্র সিংয়ের বইয়ের মানচিত্র থেকে রূপান্তরিত]

কৃষিকাজের বিকাশ, সমুদ্রপথে দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে বাণিজ্যের বিকাশ, নতুন নতুন চিন্তাভাবনার পাশাপাশি সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন হয় সপ্তম-ষষ্ঠ সাধারণ পূর্বাব্দ থেকে শুরু করে। ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রাষ্ট্রের একটা প্রাথমিক রূপ তৈরি হয়। আলাদা আলাদা গোত্র ও বংশধারাকেন্দ্রিক অঞ্চলের বিকাশ ঘটে। এই সময়ে ভারত উপমহাদেশে ষোলোটি এমন অঞ্চল ছিল। এগুলোকে ষোড়শ মহাজনপদ বলা হয়। জনপদ ও মহাজনপদের মধ্যে পার্থক্য তোমাদের জানতে হবে। ‘জন’ মানে জনতা বা মানুষজন আর পদ মানে যে-অঞ্চলে ওই মানুষেরা বিচরণ করেন, বসবাস করেন, অধিকার করেন সেই এলাকা বা অঞ্চল। বংশধারাকেন্দ্রিক নানা নাম আমরা এই সময়ের উল্লেখ করে লিখিত বিভিন্ন ধরনের উৎসে পাই। সে সম্পর্কে তোমরা উপরের ক্লাসে জানতে পারবে। আমাদের বাংলাদেশ এবং বর্তমান ভারতের পশ্চিম বাংলা আর বিহারের একটা বড় অংশ মিলে সম্ভবত মগধ ও অঙ্গ মহাজনপদ বিস্তৃত ছিল।







মৌর্য সাম্রাজ্যের আগে থেকেই উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথসহ কয়েকটি স্থলপথে বিভিন্ন বাণিজ্য ও নগরকেন্দ্রগুলো যুক্ত ছিল। সেগুলোর মধ্যে যোগাযোগ এই পথ ধরেই হতো। [উৎস : উপিন্দর সিংয়ের বইয়ের মানচিত্র থেকে রূপান্তরিত]

চলো আমরা আমাদের বৌদ্ধধর্মের বন্ধুদের কাছ থেকে/ বৌদ্ধধর্মের বই থেকে জাতকের গল্প শুনে অথবা পড়ে নিই।

তোমার জানা এমন কোনো গল্প যা তুমি কোনো লিখিত উৎস থেকে পড়োনি কিন্তু বাড়ির বড়দের মুখ থেকে শুনেছ এমন একটি গল্পের লিখিত রূপ দিয়ে দেখো তো শোনা গল্প থেকে কোনো কিছু তোমাকে পরিবর্তন করতে হয় কিনা?







দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন নগর, বাণিজ্যকেন্দ্র, বন্দর, কারিগরি পণ্য উৎপাদনের কেন্দ্র। [উৎস : উপেন্দ্র সিংয়ের বইয়ের মানচিত্র থেকে রূপান্তরিত]

এই সময় দুই ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল। একটির নাম ছিল গণ ও সঙ্ঘ। এখানে অভিজাত ক্ষত্রিয় শ্রেণির কিছু সদস্য ওই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ করত। আইন-কানুন, রীতি-নীতি ঠিক করত। আরেকটি ছিল রাজ্য, যেখানে রাজাই ছিলেন প্রধান কর্তা। বিভিন্ন মহাজনপদ এক বা একাধিক গোত্র হিসেবে বা সঙ্ঘ হিসেবে নিয়ন্ত্রণ করতো। সমাজের বিভিন্ন স্তরে তখনও শ্রেণিবিন্যাস ছিল। ছোট বা বড় ভেদাভেদ ছিল। অরণ্য বা বনবাসী মানুষকে ছোট ভাবা হতো। আরও নানারকম ভেদাভেদ ছিল। তবে ব্রাহ্মণদের দাপট ও নিয়ন্ত্রণ তখনো সকল মহাজনপদে ও জনপদে বিস্তৃত হয়নি। বিশেষ করে মগধ, অঙ্গ, বিদেহসহ পূর্বদিকের মহাজনপদগুলোতে। গণ বা সঙ্ঘেও তাদের মর্যাদা কম ছিল।

গণ বা সঙ্ঘের এই নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। রাজার শাসনকেন্দ্রিক এবং রাজবংশকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বিস্তৃত হয়। এই শাসনব্যবস্থাই সবচেয়ে বড় আর শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে রাজবংশের শাসনামলে তারা মৌর্য নামে পরিচিত।

A close-up photograph of a wooden cone, showing its smooth, light-brown surface and a small dark mark near the top. The cone is positioned diagonally, with its base at the bottom left and its tip pointing towards the top right. The background is a plain, light-colored surface.

অশোকের নাম ও কাজ সম্পর্কে জানার জন্য এবং তার সময়ের মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থা জানার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে অশোকের বিভিন্ন বাণী বা কথা খোদাই করা স্তম্ভ লিপি এবং প্রস্তর লিপি। মৌর্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তিনি তার বাণী খোদাই করা এসব লিপি স্থাপন করেন। এই লিপিগুলো অশোকের ধর্ম (প্রাকৃত ভাষায় ধর্মকে ধর্ম বলা হয়) বিভিন্ন নীতি, মানুষের জন্য কাজ আর ধর্মের বাণী লিখিত হয়েছে। তিনি তাঁর সপ্তম প্রস্তরলিপিতে, যেমন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, পরিচয়ের আর মতের মানুষের মধ্যে চিন্তার অমিল থাকলেও পারস্পরিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ ও সহিষ্ণুতার অনুরোধ করেছেন।



86

মৌর্য রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো ও বিন্যাস পরিকল্পিত এবং সুশৃঙ্খল ছিল। কেন্দ্রীয় প্রশাসন, বিচারক, কর আদায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নামের পদে আসীন ব্যক্তি ছিলেন। প্রাদেশিক এবং প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত আরও ছোট এলাকার জন্যও আলাদা আলাদা পদে নিয়োজিত কর্তা ছিলেন। ওই সময় বা তারও পরে পুণ্ড্র জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায় যা মগধেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল তখন। বঙ্গ নামক একটি স্থানের নাম আরও পরের বিভিন্ন উৎসে পাওয়া যায়।

এই সময়েই ভারত উপমহাদেশের গঙ্গা-যমুনা অববাহিকায় এবং দক্ষিণ ভারতে অসংখ্য নগরকেন্দ্র বিকশিত হয়। হরপ্পা সভ্যতার পরে একটা দীর্ঘ সময়ের বিরতির পরে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে এমন অনেক নগরকেন্দ্রের বিকাশকেই ঐতিহাসিকগণ দ্বিতীয় নগরায়ণ নামে ডাকেন। এই নগর ও নগরজীবনের নানা দিক নিয়ে অনেক বর্ণনা বিভিন্ন লিখিত উৎসে পাওয়া যায়। বড় হয়ে তোমরা সেগুলো পড়ে আনন্দ পাবে।



বর্তমানে ভারতের বৈশালীতে অবস্থিত বৌদ্ধস্তূপ এবং একটি অশোক-স্তম্ভ। বৌদ্ধস্তূপ হলো একধরনের স্থাপত্য। গৌতম বুদ্ধের পরলোকগমনের পরে তার দেহভস্ম বিভিন্ন স্থানে নিয়ে নিয়ে গিয়ে সেই দেহভস্মের উপরে এমন অর্ধগোলাকার স্থাপনা নির্মাণ করা শুরু হয়। তারপরে পুণ্য অর্জনের জন্য, বিভিন্ন সাধক ও বৌদ্ধধর্মের গুরুত্বপূর্ণ প্রচারক-শিক্ষক-চিন্তাবিদদের দেহভস্মের উপরে অথবা প্রতীক হিসেবে বিভিন্ন আকারের ও প্রকারের বৌদ্ধস্তূপ তৈরি করা হতো। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে বৌদ্ধস্তূপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধর্মচার পরিচালনা করার স্থান। মাটি দিয়ে, পাথর দিয়ে, পাথর কেটে ভারত উপমহাদেশ ও উপমহাদেশের বাইরেও এই স্তূপ তৈরি করা ও উপাসনা করার রীতি প্রচলিত হয়। আর সম্রাট অশোক তার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্তম্ভ বানিয়েছেন। স্তম্ভগুলোতে সম্রাট অশোকের প্রচারিত বিভিন্ন বাণী ও বিধি-বিধান লেখা থাকত। এসব স্তম্ভের উপরের অংশ সিংহ ভাস্কর্য, ধর্মচক্রসহ বিভিন্ন ধরনের অলংকরণ ছিল। এছাড়া, পাথরের উপরে খোদাই করে লিখিত বাণী, বিধি-বিধান, উপদেশও বিভিন্ন স্থানে অশোক স্থাপন করেন। এই লিপিগুলো সেই সময়ের ইতিহাসের দারুণ গুরুত্বপূর্ণ দলিল।





ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সম্রাট অশোকের স্তম্ভ ও প্রস্তর লিপি [উৎস : উপিন্দর সিংয়ের বইয়ের মানচিত্র থেকে রূপান্তরিত]



আজকের বাংলাদেশ আর ভারতের পশ্চিম বাংলা ও বিহার মিলিয়ে সেই সময়ের মৌর্য সাম্রাজ্যের পূর্ব দিকে অনেকগুলো নগরকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো বাংলাদেশের বগুড়ার মহাস্থানগড় এবং নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বর। মহাস্থানে প্রাপ্ত ব্রাহ্মীলিপি খোদিত প্রস্তরখণ্ডটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।



মহাস্থানের একজন কৃষক এই চূনাপাথরের ব্রাহ্মীলিপিতে লেখাটি আবিষ্কার করেন। লিপিটি মৌর্য রাষ্ট্রে প্রশাসন কর্তৃক প্রশাসনের জনগণের জন্য নানা ধরনের সাহায্য করার উদাহরণ। লিপিটিতেই সবচেয়ে পুরোনো প্রমাণ হিসেবে পুণ্ড্রনগরের নাম পাওয়া যায়। বন্যার মতন দুর্যোগে অনুদান হিসেবে ধান ও টাকা প্রদানের একটি অনুসরণীয় উদাহরণ যে হাজার হাজার বছর আগেও ছিল এই বাংলা অঞ্চলে ছিল তার প্রমাণ এই লিপি।



ঘোড়াচালিত রথে চড়ে সম্রাট অশোক যাচ্ছেন।



ভারতের মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত বিখ্যাত স্থাপনা হলো সাঁচি নামক স্থানে  
অবস্থিত বিভিন্ন বৌদ্ধ স্তূপ এবং সেই স্তূপগুলোর তোরণে ও গায়ে খোদাই করা  
বিভিন্ন ধরনের ভাস্কর্য





মৌর্য সাম্রাজ্য ও পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজ্যের এবং মগধ নামের জনপদের রাজধানী ও প্রধান নগরকেন্দ্র ছিল পাটলিপুত্র। ভারতের বিহার রাজ্যের রাজধানী পাটনায় এই পাটলিপুত্র নগরের অবস্থান ছিল। শিল্পীর চোখে সেই সময়ের পাটলিপুত্র নগরের স্থাপনা, মন্দির ও রাস্তা।

মহাস্থানগড়। এই দেয়াল ঘেরা স্থানটিই একটি নগর ছিল। সেই নগরের কাল্পনিক চিত্র। এই চিত্রে ওই দুর্গে প্রবেশ করার দরজাগুলো, নগরের মধ্যে জলাধারসহ চারদিকে পরিখা ও ডান দিকে করতোয়া নদী প্রবাহিত ছিল। করতোয়া নদীর তীরেই বগুড়ার মহাস্থানে এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই নগর মৌর্যদের সময় থেকে মৌগল আমল অর্থাৎ বসতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। বিভিন্ন আমলে এই নগরের বৈশিষ্ট্য ও বসতি পরিবর্তিত হয়েছে।



মহাস্থানগড়ের ওই সময়ের নাম ছিল পুন্ড্রনগর। দুটো নগরকেন্দ্র থেকেই ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান এবং উপমহাদেশের বাইরের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের বিভিন্ন প্রমাণ পাওয়া যায়। এই নগরগুলো ছিল উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। নগরের বাইরেই বিভিন্ন বসতি ও স্থাপনা ছিল।

ভারতের পশ্চিমবাংলার দক্ষিণে চন্দ্রকেতুগড় এবং তাম্রলিপ্তি আর উত্তর দিকে বানগড় ওই সময়ের ছোট ও বড় নগরের ধ্বংসাবশেষ বহন করে। তাম্রলিপ্তি ছিল একটি বড় সমুদ্রবন্দর। কেন্দ্রীয় শাসন ও সরকার, কর ও রাজস্ব আদায়ের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত সরকারি বিভাগ ও ব্যক্তি, আইনি ব্যবস্থাপনা—সব কিছু মিলিয়ে মৌর্য রাষ্ট্রব্যবস্থা বাংলাসহ একটি বিশাল অঞ্চলজুড়ে শাসন ও কর্তৃত্ব বিস্তার করেছিল। এই সময়ে বৌদ্ধ সম্প্রদায়, জৈন সম্প্রদায়সহ আরও নানান ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং সংসার ও বিষয় ত্যাগী শ্রামণিক (যারা সংসার ও বিষয় বাসনা ত্যাগ করে পরিরজ্যা গ্রহণ করেন, বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে অথবা সঙ্ঘবদ্ধভাবে থেকে মানুষের দানের মাধ্যমে জীবনযাপন করেন তারাই শ্রমণ) ধর্মগুলো গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

## নগরায়ণ (Urbanization):

নগরায়ণ বা শহরায়ন বলতে গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে অঞ্চলে জনসংখ্যার স্থানান্তর, গ্রামের তুলনায় নগর অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের অনুপাত ক্রমশ বৃদ্ধি এবং কোনো সমাজ যেভাবে এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয় তা বোঝায়।







মৌর্য সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার পরে ভারত উপমহাদেশে তৈরি হওয়া বিভিন্ন রাজ্য বা রাজত্ব। [উৎস : উপিন্দ্র সিংয়ের বইয়ের মানচিত্র থেকে রূপান্তরিত]



এ চন্দ্রকেতুগড়ে পাওয়া লিপিসিল মোহরে নানা ধরনের জাহাজের ছবি।



ছাপাঙ্কিত রূপা আর তামার মুদ্রা। বিভিন্ন প্রতীক রয়েছে। মহাস্থানগড়, উয়ারী-বটেশ্বরসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এমন ধরনের মুদ্রা পাওয়া গেছে। চলো আমরা এসব মুদ্রা এবং তোমার দেখা অন্য আরো কিছু মুদ্রার ছবি আঁকি।



সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর খুব গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী বা সভাসদ ছিলেন কৌটিল্য। তার লেখা অর্থশাস্ত্র সেই সময়ের অর্থনীতি-রাজনীতি-যুদ্ধনীতি-শাসনরীতি-সমাজ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। কৌটিল্যের লেখার পরে অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন প্রতিলিপি হাতে তালপাতা ও কাগজে লিখে সংরক্ষণ ও প্রচার করা হয়েছিল। অর্থশাস্ত্রের তেমনই একটি প্রতিলিপির ছবি এখানে দেওয়া হলো।



পশ্চিম বাংলার চন্দ্রকেতুগড় থেকে শুজা শাসনামলে শিল্পী ও কারিগরদের তৈরি করা পোড়ামাটির ভাস্কর্য পাওয়া গেছে। তেমনই ফলকে সেই কালের সাধারণ মানুষের জীবন। এটিতে বাঁকে করে কলসে জল বা দুধ বা অন্য কিছু বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন তিনজন পুরুষ। ফলক আংশিক ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গেছে।

সামাজিক ক্ষেত্রেও নানা ধরনের বদল আসে। ধনী, গরিব, দাসসহ বিভিন্ন শ্রেণি তৈরি হয়। একটি নির্দিষ্ট গোত্র বা বংশধারা কিংবা নির্দিষ্ট পেশাজীবী দলের ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। এই দলটিই কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হয় একটি আলাদা জাতিবর্ণ হিসেবে। এদের একটা বড় অংশ বেদ এবং বেদকেন্দ্রিক নানা ধরনের শাস্ত্র প্রবর্তন করেন, প্রচলন করেন। আর যারা এই শাস্ত্রগুলো অনুসরণ করতেন না তাদের নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করেন। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ বিশেষ বংশধারার নেতৃত্ব শুরু হয়।



মহাস্থানগড়ে খননে পাওয়া লোহার তৈরি বিভিন্ন অস্ত্র। বিশেষ করে তীরের ফলা।

এই সময়েও কিন্তু ভারত উপমহাদেশের বাইরে থেকে নানা মানুষ গোত্রবদ্ধভাবে বাণিজ্যের জন্য, যুদ্ধের জন্য, বসতি স্থাপন করার জন্য এসেছে। বর্তমান আফগানিস্তান হয়ে মধ্য এশিয়া, গ্রিস, পারস্য থেকে মানুষ এসেছে। রেশম পথ (সিল্ক রোড নামে পরিচিত) নামে যে দীর্ঘ একটি স্থল বাণিজ্যপথ চীনের মধ্য দিয়ে মধ্য এশিয়া হয়ে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সেই পথের সঙ্গে ভারত ও বাংলার নানা অংশ যুক্ত ছিল। রেশম পথ নাম হলেও কেবল উন্নতমানের সিল্ক বা রেশমবস্ত্র নির্ভর বাণিজ্যই এই পথে চলতো না। তোমরা হয়তো ক্যারাভান শব্দটি শুনেছ। ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ি, বা গরুর গাড়ি মিলিয়ে যখন বণিকগণ দুর্গম বা সুগম স্থলপথ দিয়ে বাণিজ্যের জন্য যাতায়াত করতেন সেই পরিবহনকে বলে ক্যারাভান।

চলো একটি ক্যারাভানের ছবি ঐকে ফেলি।



গ্রিসের সম্রাট আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট এ সময় ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমের কিছু অংশ যুদ্ধের মাধ্যমে দখল করে নেন। তিনি গ্রিস থেকে সাম্রাজ্য বিস্তার করার জন্য দেশের পর দেশ অধিকার করতে করতে ভারত উপমহাদেশ অন্দি পৌঁছান। কিন্তু নদী ও নানা কারণে তিনি উত্তর ভারত ও পূর্ব দিকে আগাতে ব্যর্থ হন। কিন্তু তার এই অভিযানের সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছিল। এই অভিযানের ফলে নতুন নতুন যোগাযোগ, অভিবাসন ও বাণিজ্যের পথ খুলে যায়। পরের ইতিহাসে এই অভিযানের প্রভাব দেখতে পাবো। বিভিন্ন ভাষা, আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, ধর্মবিশ্বাস, জীবনযাপনের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ, বিনিময় আর একের অপরকে প্রভাবিত করার যে প্রক্রিয়া প্রাগৈতিহাসিক আমল থেকেই শুরু হয়েছিল, তা চলতে থাকে।



মহাস্থানের অবিভক্ত বাংলা থেকে পাওয়া পাথরে খোদাই করা সমুদ্রগামী জাহাজের মডেল

অন্যদিকে নদী ও সমুদ্রপথে বাণিজ্য ও যোগাযোগ এসময়ে একদিকে রোমান সাম্রাজ্যের নানা কেন্দ্রে, অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে চলতে থাকে। এই যোগাযোগের প্রক্রিয়াটা সব সময় সরাসরি ছিল না। এক বন্দর থেকে আরেক বন্দরে, সেই বন্দর থেকে অন্য এক বন্দরে—এভাবে বিভিন্ন পণ্য সরবরাহ ও সংগ্রহ করা হতো। নাবিক ও বণিকগণ সামুদ্রিক বায়ু, আকাশের তারা আর সমুদ্রস্রোতের উপরে নির্ভর করে তখন দূরের এই যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

বাংলার ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্য অনন্য ছিল আর এখনও আছে, সেটা হলো এখানকার নদীব্যবস্থা। জালের মতন বিস্তৃত নদীনালা, পানি আর জমির বৈশিষ্ট্য যেমন যোগাযোগে সুবিধা দিয়েছিল, তেমনই বাইরের এই ধরনের পরিবেশের সঙ্গে অপরিচিতদের অসুবিধার কারণও ছিল।

নদী, স্থল আর দক্ষিণের সমুদ্র মিলিয়ে তৎকালীন বাংলাদেশের চাষাবাদ-বাণিজ্য-যোগাযোগ-ব্যবসাকেন্দ্র পরিচালিত হতো। আমাদের অঞ্চলের আরেকটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো মৌসুমি বায়ু ও বৃষ্টিপাত।

### নদী (River):

নদী সাধারণত মিষ্টি জলের একটি প্রাকৃতিক জলধারা যা ঝরনাধারা, বরফগলিত স্রোত অথবা প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়ে প্রবাহ শেষে সাগর, মহাসাগর, হ্রদ বা অন্য কোনো নদী বা জলাশয়ে পতিত হয়।







সমুদ্রগামী জাহাজের কাল্পনিক চিত্র। এ ধরনের জাহাজে তৎকালীন আরবীয় বণিকরা ভারত মহাসাগর, আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরে বাণিজ্য করতেন



নদীর তীরে অবস্থিত একটি নগর আর নৌকা। বাংলাদেশের পুন্ড্রনগরকে কল্পনা করে আঁকা (সূত্র: সুজা-উদ-দৌলার চিত্রের রূপান্তর)



দড়ি আর কাঠ দিয়ে এমন জাহাজ তৈরি করতে হতো। বাংলা ও উড়িষ্যা অঞ্চলে।



সমুদ্রগামী জাহাজের পুনর্নির্মিত ছবি। বাংলা ও উড়িষ্যাসহ বিভিন্ন জায়গার বন্দর থেকে এধরনের জাহাজে সমুদ্রবাণিজ্য পরিচালিত হতো।

আমরা কতো কতো নৌকা বা জাহাজের ছবি ও মডেল দেখলাম। চলো এবার একটা মজার কাজ করি। মাটি অথবা কাগজ দিয়ে ঐ সব নৌকা ও জাহাজের মডেল বানিয়ে বন্ধুদের দেখাই।

মৌসুমি বায়ু দক্ষিণ এশিয়া এবং ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জলবায়ুতে সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তারকারী বায়ুপ্রবাহ। গ্রীষ্ম ও শীত মৌসুমে সমুদ্র ও ভূপৃষ্ঠের উত্তাপ এবং শীতলতার তারতম্যের ফলে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের দিকও পরিবর্তিত হয়। এই পানি, নদী আর জমির চেহারা বছরের বিভিন্ন সময়ে তাই বদলে যেতো। বর্ষাকালে একরকম, শীতকালে একরকম, গ্রীষ্মকালে একরকম। এই পরিস্থিতি বাইরের বিভিন্ন রাজা, শাসক বা অভিযানকারী বাহিনীকেও বিভিন্ন সময়ে এই অঞ্চলে যুদ্ধ পরিচালনা করা, এখানকার জমি অধিকার করা, এখানে বিভিন্ন এলাকায় কর্তৃত্ব বজায় রাখা কঠিন ছিল। নদীপথে যুদ্ধ পরিচালনা করার ক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জন না করলে, বৃষ্টির মধ্যে, বন্যার মধ্যে যুদ্ধ করার যোগ্যতা না থাকলে এই এলাকায় হামলা করা, কর্তৃত্ব করা আর শাসন করা অসম্ভব ছিল। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করতেও এই প্রকৃতি, বৃষ্টি আর নদী বিরাট ভূমিকা রেখেছিল।



ভারতের পশ্চিম বাংলার চন্দ্রকেতুগড়ে পাওয়া ভাস্কর্যে প্রাক সাধারণ চতুর্থ-তৃতীয় শতকে ধান কাটার দৃশ্য

উত্তরের হিমালয় পর্বত ও সংলগ্ন এলাকায় বর্ষাকালে যে বৃষ্টিপাত হতো, সেই বৃষ্টির পানি এখানকার মতন তখনও বাংলাদেশের নদীনালা দিয়ে নিষ্কাশিত হয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পলি বহন করে নিয়ে যেতো। বর্ষাকালের বাণিজ্য ও যোগাযোগ আর শীতকালে যখন নদীতে পানি কম থাকতো বা কোনো কোনো নদী শুকিয়ে যেতো, তখন যোগাযোগের ধরনে পার্থক্য ছিল। এই বৃষ্টি ও পলির সঙ্গে চাষাবাদের সম্পর্ক যে কতোটা গভীর ছিল আর এখনও আছে, সেটা তোমরা সবাই জানো। আমাদের দেশে ধান চাষ আর আমাদের প্রধান খাদ্য ভাত হওয়ার পিছনেও এখানকার বৃষ্টিপাত, নদী, পানির সঙ্গে জমির সম্পর্ক একটা কারণ। তোমরা জেনে অবাক হবে যে, সাধারণ পূর্বাব্দ চতুর্থ-তৃতীয় শতকে বাংলা অঞ্চলের অন্যতম প্রধান নগর ও বন্দর বর্তমান পশ্চিম বাংলার চন্দ্রকেতুগড় থেকে পাওয়া পোড়ামাটির ফলকে ধান কাটার চিত্র খোদাই করা পাওয়া গেছে। আরও পাওয়া গেছে তৎকালীন নৌকা ও জাহাজের চিত্র। পরিবেশ,



উয়ারী-বটেশ্বরে আবিষ্কৃত বিভিন্ন স্বল্প মূল্যের পাথরের পুঁতি





মহাস্থানের নিকটে বসতির কাল্পনিক চিত্র।

পানি, নদী ও প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে আবাদ করা, যোগাযোগ করা আর বাণিজ্য পরিচালনা করার এমন উদাহরণ ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। বাংলাদেশসহ বাংলা অঞ্চলের মানুষ যে কেবল চাষাবাদ করতো না; বরং ভারত উপমহাদেশের নানা অংশের সঙ্গে আর উপমহাদেশের বাইরেও নানা অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ ও বাণিজ্য পরিচালনা করতো, তার নতুন নতুন প্রমাণ ইতিহাসবিদগণ আবিষ্কার করে চলেছেন।





মগধের আরেকটি বড় নগর এবং গৌতম বুদ্ধের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত কুশীনগরের প্রধান প্রবেশ তোরণের কাল্পনিক চিত্র



মহাস্থানগড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে আবিষ্কৃত ইটের তৈরি রাস্তা। বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের প্রত্নতত্ত্ববিদগণের একটি দল এগুলো খুঁড়ে বের করেছেন।



উয়ারী বটেশ্বরে খননে আবিষ্কৃত একটি জলাধার



মহাস্থানগড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে আবিষ্কৃত দুর্গের গোলাকার বুরুজ । বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের প্রত্নতত্ত্ববিদগণের একটি দল এগুলো খুঁড়ে বের করেছেন।

চলো এবারে আমরা মহাস্থানগড় ও উয়ারী বটেশ্বর থেকে কী কী জিনিস পাওয়া গেছে তার ছবি নিচের ছকে ঐকে ফেলি।

স্থান	নিদর্শনসমূহ
মহাস্থানগড়	
উয়ারী বটেশ্বর	



## সাম্রাজ্যের ভাঙন, নতুন রাজ্য, সমাজের বদল

কোনো সাম্রাজ্যই চিরস্থায়ী নয়। অশোকের মৃত্যুর পরেই বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন নতুন বংশধারাকেন্দ্রিক রাজত্বের উত্থান শুরু হয়। মৌর্য শাসকদের নিয়ন্ত্রণ কমেতে থাকে। নতুন রাজত্ব ও শাসকগণ নতুন নতুন রাজত্ব তৈরি করে প্রভাব বিস্তার করেন। আগের লক্ষ লক্ষ বছরের মতন ভারত উপমহাদেশের বাইরে বিভিন্ন স্থান বা অঞ্চল থেকে মানুষের আগমনের ধারাটি চলতে থাকে। অনেক সময় বাইরের কোনো কোনো গোষ্ঠী বা গোত্র বা বংশধারা ভারত উপমহাদেশের কোনো কোনো অংশের উপরে শাসন বিস্তার করতে সক্ষম হয়ে ওঠে। ফলে মৌর্য শাসনের শেষ দিক থেকে বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন গোত্রের মানুষ প্রভাব বিস্তার করা শুরু করে। বর্তমান আফগানিস্তান থেকে ব্যাকট্রিয়-গ্রিকগণ, মধ্য এশিয়া থেকে শক-পল্লব (সিথো-পার্থিয়ান), কাছাকাছি অঞ্চল থেকেই কুশান (বা কুই-শ্যাং), পশ্চিম ভারতে শক-ক্ষত্রপ, দক্ষিণাভ্যে সাতবাহন, দক্ষিণ ভারতের প্রান্তে চেরা, চোলা ও পাণ্ড্য রাজত্বের বিভিন্ন প্রমাণ পাওয়া যায়। মধ্য এশিয়া, চীনের প্রভাববলয় আর পারস্যের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী উপমহাদেশে আগমন করে আর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে। মৌর্যদের সাম্রাজ্য ও প্রভাব না-থাকলেও রাষ্ট্র ও রাজ্য পরিচালনায় প্রশাসনিকে শ্রেণিবিন্যাস, বাণিজ্যিক যোগাযোগ আর বিভিন্ন স্থান নগর-কেন্দ্রের বিকাশ অব্যাহত থাকে। আমাদের একটা ধারণা আছে যে, একটি সাম্রাজ্য বা কেন্দ্রীয় রাজা বা সম্রাট ও প্রশাসনের অধীনে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজস্ব-কর আদায়, কৃষি জমির সম্প্রসারণ ও শস্যের উৎপাদন বাড়ে। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহ মধ্যেও যে বাণিজ্য ও নগর-কেন্দ্রের বিকাশ চালু থাকতে পারে, তার প্রমাণ হলো এই সময়কাল।



গুপ্ত এবং সাতবাহন শাসনকালে ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাসনের ও শাসকদের অবস্থান। যা সাম্রাজ্যে সময়ের সঙ্গে বিস্তৃত হয়েছে, আবার সংকুচিত হয়েছে।



বিভিন্ন অঞ্চল দখল করা নিয়ে সংঘাতের পাশাপাশি পূর্ব বাইরের ও ভিতরের মধ্যের নানা ধরনের নতুন নতুন মানুষ-এলাকা-জীবনব্যবস্থার যোগাযোগ তৈরি হয়। বিভিন্ন জায়গার মানুষ ব্যবসা, পর্যটন, ধর্মমত প্রচারের জন্য অনবরত আগমন করতে থাকেন। ভারত উপমহাদেশ থেকে বৌদ্ধ শ্রমণগণ চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা দেশ, আফগানিস্তান হয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে ধর্ম প্রচারের জন্য গমন শুরু করেন। তবে যে মগধের প্রভাববলয়ের অংশ ছিল আজকের বাংলাদেশের বেশির ভাগ অংশ সেই অঞ্চলেও বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্যবাদী সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

শুঙ্গ রাজবংশ এই পরিবর্তনকে সমর্থন করেছিল। অন্যদিকে কুশান রাজবংশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও তাদের প্রধান এলাকা ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারত উপমহাদেশ (আজকের পাকিস্তান, আফগানিস্তানের অংশ বিশেষ এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশ)। বাংলাদেশে শুঙ্গ ও কুশানদের প্রভাব কতোটা ছিল তা এখনো সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়নি। তবে মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে ধারণা করা হয়, এ সময়েও এই নগরীতে মানুষের বসবাস এবং কাজকর্ম অব্যাহত ছিল। তবে এই নগরী কুশান বা শুঙ্গদের অধীন ছিল কি না, সেটা নিশ্চিত না। মৌর্যদের সময় এই পুন্ড্রনগর যেভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ নগরকেন্দ্র ছিল প্রশাসনিকভাবে সেভাবে এই সময় এই নগরের মর্যাদা ছিল কি না, তা-ও স্পষ্ট না। কিন্তু মহাস্থানগড় ও উয়ারী-বটেশ্বর যে বাণিজ্য এবং মানুষের বসবাসের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে তাদের অবস্থান অটুট রেখেছিল, তা বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে ধারণা করা যায়।



কুশান সম্রাট তৃতীয় কণিষ্কর সময়ে জারি করা সোনার মুদ্রা



কুশান সম্রাট হুবিল্কের সময়ে জারি করা সোনার মুদ্রা



বাংলাদেশের মহাস্থানগড় বা প্রাচীন পুন্ড্রনগরের আকাশ থেকে তোলা ছবি। চারপাশে পরিখা (নালার মতো খাদ, যাতে পানি থাকতো।) ঘেরা দুর্গপ্রাচীর ঘেরা ছিল নগরকেন্দ্রটি।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কুশান সম্রাটদের সময়ে জারি করা মুদ্রা এবং শূঙ্গাদের সময়ে পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গেছে। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে বা রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশ ওই রাজত্বের অংশ থাকার কোনো স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পদ্রব্য হিসেবে এসব মুদ্রা ও চিত্রফলক এই নগরীতে আসতে পারে। ভারতের পশ্চিম বাংলার চন্দ্রকেতুগড়ে শূঙ্গ শাসনামলের সমসাময়িক পোড়ামাটির চিত্রফলক পাওয়া গেছে অনেক। কিন্তু ওই নগরী শূঙ্গ শাসনের অধীন ছিল কি না, তা বোঝা মুশকিল। ইতিহাসে এমন অনিশ্চয়তা বা প্রশ্ন থেকেই যায়।



## প্রশাসন, সামন্ত আর রাজত্ব: সাম্রাজ্যের ফিরে আসা

ভারত উপমহাদেশের নানা রাজ্য ও শাসনে বিভক্ত অঞ্চলগুলোর মধ্যে উত্তর, উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাংশের অঞ্চল আবারও একটি বিরাট এলাকাজুড়ে শাসন বিস্তৃত হয় সাধারণ অব্দ তৃতীয় শতকের দিকে। নতুন এই রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্য গুপ্ত সম্রাটগণ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতেন। এই সাম্রাজ্যের অধীনে করদ বা অধীনস্থ ছোট ছোট রাজ্যও ছিল। অন্যদিকে, ভারত উপমহাদেশের দক্ষিণে বকাতক রাজাদের শাসনাধীনে আরেকটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।



গুপ্ত যুগের সোনার মুদ্রার নমুনা

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল, বিশেষ করে বর্তমান দিনাজপুর জেলা থেকে গুপ্ত সম্রাটদের জারি করা বেশ কয়েকটি তাম্রলিপি পাওয়া গেছে। এগুলো প্রধানত জমি বেচাকেনার দলিল। এ ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে গুপ্ত সম্রাটদের জারি করা বিভিন্ন ধরনের সোনার মুদ্রা পাওয়া গেছে। তখন এই সোনার মুদ্রাব্যবস্থার নাম ছিল দিনার। তবে মানুষ দৈনন্দিন জীবনে আরও নানা ধরনের বিনিময় পদ্ধতি ব্যবহার করতো। বিভিন্ন লিখিত ও প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস থেকে এই সময়ের সমাজ, প্রশাসন, বাণিজ্য, কৃষি, করব্যবস্থা সম্পর্কে নানা ধরনের তথ্য জানা যায়। বড় হয়ে তোমরা সেগুলো ভালোভাবে জানতে পারবে।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় রাষ্ট্র খুব স্তরবিন্যস্ত প্রশাসনিক ও রাজস্বব্যবস্থার অধীনে ছিল। সাম্রাজ্যকে ভাগ করা হয়েছিল প্রদেশে। এগুলোর নাম ছিল দেশ বা ‘ভুক্তি’। প্রদেশের অধীনে ছিল যে এলাকা, তার নাম ছিল ‘বিষয়’। বিষয়ের অধীনে ছিল ‘বীথি’ বা



গুপ্ত যুগের পোড়ামাটির ভাস্কর্য। এগুলো মানুষের স্বাভাবিক আকারের মতন বড়।



পট্ট বা পঠক বা পেট্টা। সবার নিচে ছিল ‘গ্রাম’। আমাদের আজকে যেমন প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কর্মকর্তা থাকেন, তখনও তেমন কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাদের সভা ছিল। তার নাম ছিল অধিকরণ। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা নাম ও পদবি ছিল। যেমন ধরো, বাংলাদেশে পাওয়া একটি তাম্রলিপি অনুসারে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির (মোটামুটিভাবে বর্তমান রাজশাহী, দিনাজপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও আর ভারতের পশ্চিম বাংলার সংলগ্ন অঞ্চল) অধীনস্থ কোটিবর্ষ বিষয়ের (বর্তমান ভারতের পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বানগড়কে এই বিষয়ের কেন্দ্র মনে করা হয়) অধিকরণে ছিল: বিষয়পতি বা উপরিক (প্রধান কর্মকর্তা), নগর-শ্রেষ্ঠী (নগরের প্রধান বণিক বা তখনকার মহাজন), স্বার্থবাহ (যারা ঘোড়া বা



গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের ঘোড়ায় চড়া প্রতিকৃতি  
খোদিত সোনার মুদ্রা



গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের প্রতিকৃতি অঙ্কিত  
সোনার মুদ্রা



গুপ্ত যুগের মন্দির

গরুর গাড়িতে বা স্থলপথে পরিবহন করতেন তাদের প্রধান), প্রথম-কুলীক (কারিগর বা ব্যবসায়ীদের প্রধান), প্রথম-কায়স্থ (নথি-দলিল লেখক বা রাজস্ব আদায়কারীদের প্রধান)। তাহলে তোমরা লক্ষ করবে যে, সেই সময়েও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য উঁচু থেকে নিচ অবধি বিভিন্ন পর্যায়ে নানা ধরনের কাজের জন্য নানা পদে নিযুক্ত মানুষ ছিলেন। এ ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা প্রশাসনিক ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল।

এই সময়ে কৃষিকাজের যেমন প্রসার ঘটে তেমনই নানা অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও বিস্তার লাভ হয়। সেনাবাহিনীর জন্য আলাদা বরাদ্দ ও পেশার মানুষ ছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রধানত সংস্কৃত ভাষা রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে ব্যবহৃত হওয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ভাষায় নানা সাহিত্য, আইন-কানুন আর লেখা পত্রও বেশ পাওয়া যায় এ সময়ের।



গুপ্ত যুগের পোড়ামাটির ফলক।



গুপ্ত আমলের তাম্রলিপি। জমি বিক্রির দলিল।





বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল থেকে পাওয়া গুপ্ত তাম্রলিপিগুলোর পাওয়ার স্থান। বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের তালিকা।



অতীশ দীপঙ্কর



গুপ্ত আমলের গুহার ভাস্কর্য ও দেয়ালচিত্রের মধ্যে একটি গুহার ভাস্কর্য। পাথর কেটে গুহার মধ্যে এসব ভাস্কর্য খোদাই করা হয়েছে। সেই সময়ের শিল্পকর্ম ও প্রযুক্তির অসাধারণ উদাহরণ এগুলো।

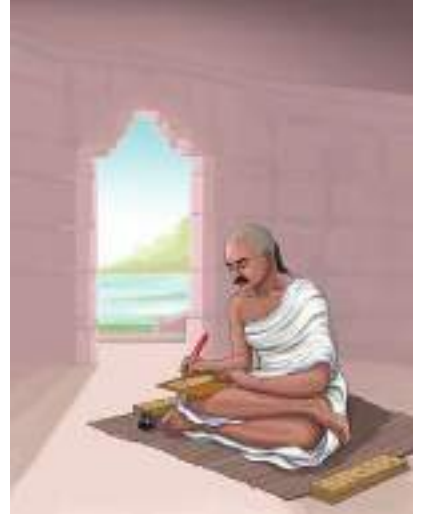




ইলোরার একটি পাথর খোদাই করে তৈরি করা মন্দির



নালন্দা মহাবিহার (বর্তমান ভারতের বিহারে অবস্থিত) একটি বৌদ্ধ কেন্দ্র ও শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হয় গুপ্ত আমলে।



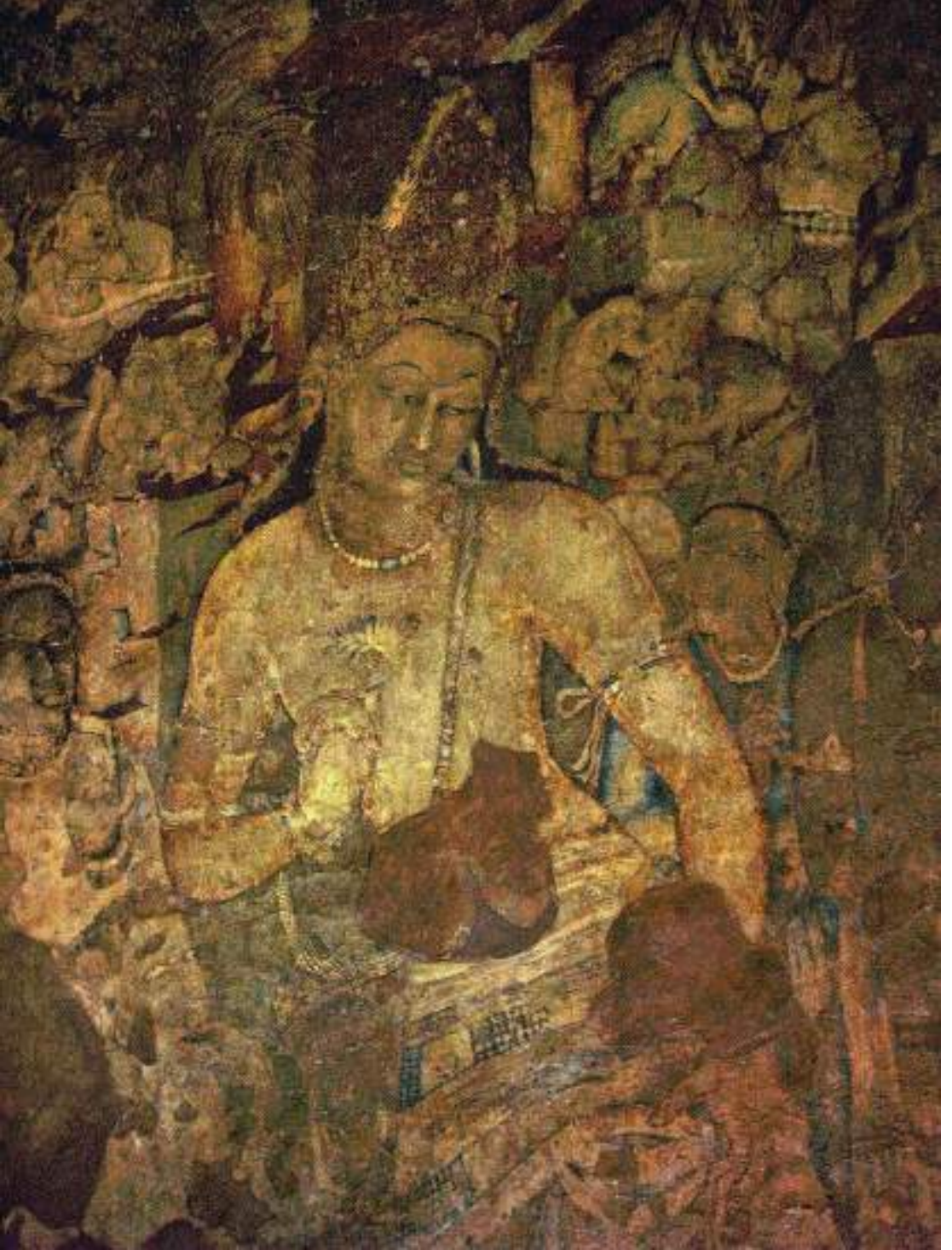
কালিদাস লিখিত মহাকাব্য মেঘদূত থেকে একটি দৃশ্য কল্পনা করে আঁকা হয়েছে। তিনি গুপ্তদের শাসনকালে এই কাব্য রচনা করেন।

মহাকবি কালিদাস কাব্য রচনা করছেন (কাল্পনিক চিত্র)। তার সময়কাল গুপ্ত শাসনকাল।



ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রাপ্ত গৌতম বুদ্ধের প্রতিমা





অজন্তার গুহাচিত্র

চলো এখন আমরা সাম্রাজ্য গুলোর পর্যায়ক্রমিক তালিকা তৈরি করি এবং ঐ সাম্রাজ্যগুলোর দুটি করে উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের নাম লিখি ও ছবি আঁকি।





অজন্তার গুহাগুলোর ছবি। পাহাড়ের মধ্যে কেটে এই গুহাগুলো শিল্পী ও কারিগরেরা তৈরি করেছিলেন



অজন্তার গুহাচিত্র